

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রেট্রিক হেনরি আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বলেছিলেন, 'জীবন কি এতই প্রিয় আর শান্তি কি এতই মধুর যে, শিকল আর দাসত্বের দামে তাকে কিনতে হবে? আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু।' দেশের অধিকাংশ জনগণ এই বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করলেও অনেক আমেরিকান ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছে। ব্রিটিশ শাসন কার্যকর রাখার চেষ্টা করেছে।

◀ পিখনফল-১

- ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি কে ছিলেন? ১
খ. পাক হানাদাররা প্রথমেই ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় কেন? ২
গ. ব্রিটিশদের সহযোগিতাকারী আমেরিকানদের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোন জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে? নিরুপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পেট্রিক হেনরির বক্তব্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী।

খ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন নস্যাত্ত করার জন্য পাক হানাদাররা প্রথমে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রত্যেকটা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সকল আন্দোলনে ছাত্ররা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। যার ফলে পাক হানাদার বাহিনী ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। কেননা তারা জানত যে ছাত্ররাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল রূপকার ছিল।

গ ব্রিটিশদের সহযোগিতাকারী আমেরিকানদের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার বিরোধীদের সামঞ্জস্য আছে।

ব্রিটিশদের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমেরিকার অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। দেশের অধিকাংশ জনগণ ব্রিটিশদের বিরোধিতা করলেও কিছু সংখ্যক আমেরিকান ব্রিটিশ শাসন কার্যকর রাখার জন্য তাদের সাহায্য করেছে। একইভাবে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালি হয়েও পাক-হানাদার বাহিনীকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।

দক্ষিণপন্থি ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এসব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, জমিয়ত-ই-উলামায়ে ইসলাম, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও পিডিপি ইত্যাদি। এসব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বহির্বিধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো

হয়। তারা পাকিস্তান বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থকদের নিয়ে দেশব্যাপী 'শান্তি কমিটি' গঠন করে। এর নাম শান্তি বাহিনী হলেও এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থকদের দমনে পাকিস্তানিদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এছাড়া রাজাকার, আল বদর, আল শামস নামে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়। এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রগতিশীল শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী ও পেশাজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা স্বাধীনতার সূর্যকে স্তিমিত করতে পারেনি।

ঘ উদ্দীপকে প্রেট্রিক হেনরির বক্তব্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রেট্রিক হেনরি আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি বক্তব্য দেন। এই বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকার অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য যে ভাষণ প্রদান করেন সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার আপামর জনগণ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি শাসকবর্গ ১৯৪৭ সালের পর থেকে নিরীহ বাঙালির ওপর চালিয়েছিল নির্যাতনের স্টিমরোলার। ফলে এ সকল নির্যাতন, জুলুম, প্রহসনের বিরুদ্ধে বীর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল। বাঙালি পাক শাসকচক্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে ঐক্যবন্ধভাবে অধিকার আদায়ে দৃঢ়সংকল্প করে তুলেছিল। ফলে সংঘটিত হয়েছিল ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬২, ৬৬, ৬৯-এর আন্দোলন, '৭০ এর নির্বাচন এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বীর মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে দীপ্ত সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে। দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল স্বীয় সিংহাসনে অটল। তারা উদ্দীপ্ত মননশীল দেশপ্রেম আর দেশের মানুষের প্রতি মমতায় সিক্ত হয়ে নিজের জীবন বাজি রেখেছিল। অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে হাতে রাইফেল নিয়ে পাষাণ পাক হানাদার বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিল। নিজের জীবন দিয়ে তারা অর্জন করেছে দেশের স্বাধীনতা। বাঙালিকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ জাতির সম্মান। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন দিয়ে বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত পেট্রিক হেনরির বক্তব্য বাংলাদেশের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ▶ ২ এক ব্যক্তি এক প্রসঙ্গে বললেন, “আমি এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই”— নেতার এই নির্দেশ পেয়ে অনুসারীরা যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা ইতিহাসে বিরল।

◀ পিখনফল-২

- ক. ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কোথায় বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন?
- খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি কী ছিল?
- গ. উদ্দীপকের নির্দেশটি কোন ব্যক্তির? উক্ত নির্দেশের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উক্ত নির্দেশটিতে যা ঘটেছে তা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে— বিশ্লেষণ করো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

খ ২৬ মার্চ ১৯৭১ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি ছিল, “ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ ইহতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যার তা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”

গ উদ্দীপকের নির্দেশটি ইয়াহিয়া খানের। উক্ত নির্দেশের কার্যকারিতা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করেন। ১৫ মার্চ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার জন্য ঢাকায় আসেন। কিন্তু আলোচনা শেষ না করেই ঢাকা ছেড়ে চলে যান। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে বাঙালিদের আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে যান। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন— আমি এদেশের মানুষ চাই না মাটি চাই। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ পেয়ে গভর্নর টিক্কা খান তার অধীন সৈন্যদের নিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শুরু হয় মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। হানাদার বাহিনী প্রথমেই হামলা চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ ও ইকবাল হলে (বর্তমান জহিরুল হক হল)। শত শত ছাত্রদের লাশ সেদিন এ দুটি হলের সিঁড়িতে, বারান্দায় স্তূপ হয়েছিল। একইভাবে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চলে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সামরিক অভিযানের নাম Operation Search light এবং এ হত্যায়জ্ঞে কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই বাঙালির ইতিহাসের এ রাত কালরাত নামে পরিচিত। অর্থাৎ বলা যায়, ইয়াহিয়া খানের উক্ত নির্দেশে সংঘটিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড।

ঘ উক্ত নির্দেশ অর্থাৎ ২৫ মার্চের গণহত্যার নির্দেশ ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা শেষ না করে সন্ধ্যায় বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে বাঙালির আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সৈন্যদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে যান। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন— আমি এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই।” ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গভর্নর টিক্কা খান তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর

ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। হানাদার বাহিনী প্রথমেই হামলা চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আক্রমণের কারণ হলো পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই যেকোনো আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা রকেট হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় হল দুটিতে। সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয় দুটি ছাত্রাবাসের একটি প্রাণীও যেন বেঁচে না থাকে। পিলখানায়ও একইভাবে গণহত্যা চালায়। ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে সারা দেশে নৃশংস হত্যা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বাঙালির ইতিহাসে এ রাত কালরাত নামে পরিচিত।

সুতরাং বলা যায়, ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ২৫ মার্চ রাতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

প্রশ্ন ৩ ধানমন্ডি লেকের পারে রবীন্দ্র সারোবরের উন্মুক্ত মঞ্চার সামনে শেষ বিকেলের রোদে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে শিশু, নর-নারীসহ অগণিত মানুষ। কারণ, কিছুক্ষণ পরেই সেখানে অনুষ্ঠিত হবে ‘ট্রিবিউট টু দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ নামের অনুষ্ঠানটি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনকে স্মরণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতেই প্রথম আলো, এবিসি রেডিও ও দেশ টিভি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে। কারণ, পৃথিবী বিখ্যাত এই গুণী দু’শিল্পী আজ থেকে ৪০ বছর আগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাংলাদেশের গণহত্যা, রক্তের স্রোত, শরণার্থী শিবিরের আশ্রিত মানুষের বেদনার আর্তি তুলে ধরেছিলেন একটি কনসার্টের মাধ্যমে। যোদ্ধাহত মানুষের জন্য তারা তহবিলও সংগ্রহ করেছিলেন।

শিখনফল-৪

- ক. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে কখন?
- খ. বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে দুর্বল করার পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করো।
- গ. উদ্দীপকে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে— তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়।

খ বাংলাদেশকে বুদ্ধিভিত্তিক দিক দিয়ে দুর্বল করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী এদেশীয় আলবদর, রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় জাতির সূর্যসন্তানদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে তারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ শুরু করে দুই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বাংলাদেশ যেন বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে তাদেরকে নিখাতন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইজিত দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নামক আঞ্চলিক প্রদেশ গঠিত হয়। তবে ভৌগোলিক অবস্থান তথা ভূ-খণ্ডের আয়তন, জনসংখ্যা সব দিক দিয়েই পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র

হওয়ার যোগ্যতা রেখেছিল। তারপরও শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের অধীন করে রাখা হয়। কিন্তু বাঙালি এ অধীনত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বাঙালি স্বাধীন চেতা জাতি, তাই তারা কারো অধীনত্ব পছন্দ করে না। এজন্যই তারা নানা আন্দোলন, বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছে বার বার। লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত আঞ্চলিক এদেশের স্বায়ত্তশাসন দাবি, সোহরাওয়ার্দীর অঞ্চল বাংলার প্রস্তাব প্রভৃতি বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহাকে তুলে ধরে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্ষমতা না পাওয়া বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করে। আর এভাবেই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি।

ঘ আমি মনে করি উল্লিখিত যুদ্ধে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দীর্ঘ নয় মাস চলতে থাকা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এদেশের সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে এদেশের মানুষ নানা কৌশল গ্রহণ করে। আর দেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহায় প্রাণ হারান এদেশের ৩০ লক্ষ মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অনেক আগ থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষকে নানা অত্যাচার নির্যাতন করে। নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনে এদেশের দামাল ছেলেদের প্রাণ দিতে হয়েছে। এরপর নানা পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এদেশের লক্ষ লক্ষ জনতা। কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক সব ধরনের মানুষ তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানিদের বর্বরতার শিকার হয়ে এদেশের অনেক মানুষের সলিল সমাধি হয়। এ প্রেক্ষিতে শুরু হওয়া যুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হন এবং ২ লক্ষ নারী তাদের সন্তান হারান।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদের সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল সবুজের পতাকা সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ▶ ৪ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের বজোপসাগরের তীরবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’। বাতাসের প্রচণ্ডতায় এবং বানের পানিতে ভেসে যায় উপকূলবাসীর তিল তিল করে গড়ে তোলা শেষ আশ্রয়স্থল। ভেসে যায় সম্পদসহ অনেক তাজা প্রাণ। সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন নিঃস্ব তখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মানুষ দ্রুত তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। সঠিক পরিকল্পনাই এনে দিয়েছে পূর্ণ সফলতা।

◀ *সিখদফল-৪*

- ক. টিক্কা খান কে ছিলেন?
- খ. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের কার্যক্রম কী ছিল?
- গ. উদ্দীপকে সিডর পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কোন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. “সঠিক পরিকল্পনাই এনে দিতে পারে পূর্ণ সফলতা”— উদ্দীপকের আলোকে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক টিক্কা খান পূর্ব বাংলার সামরিক শাসক ছিলেন।

খ স্বাধীনতা বিরোধীরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে।

স্বাধীনতা বিরোধীরা দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান হোতা ছিল তারা। তাদের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে হটানোর জন্য গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি।

গ উদ্দীপকে সিডর পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেক্টর ব্যবস্থাপনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মূলত, মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেয়। প্রথম থেকেই উর্ধ্বতন বাঙালি অফিসাররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে পুনঃগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী আর প্রধান সেনাপতি হন জেনারেল ওসমানী। মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল রণাঙ্গনকে মোট ৪টি সেক্টরে ভাগ করেন। তবে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে ১১-১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে সেক্টর কমান্ডারদের অধিবেশনে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সীমানা চিহ্নিত করার পাশাপাশি একজন কমান্ডারের অধীনে প্রতিটি সেক্টর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে সঠিক পরিকল্পনার ফলে ৯ মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সিডরে সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন নিঃস্ব তখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল পরিকল্পনাই এনে দিয়েছে পূর্ণ সফলতা। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সঠিক পরিকল্পনাই পারে পূর্ণ সফলতা এনে দিতে। নিচে এ উক্তিটির সপক্ষে উদ্দীপকের আলোকে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করা হলো :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা এক সোনালি অধ্যায়। কারণ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংস, নির্যাতন ও গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। এ লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত নিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমর্থন ও জনমত আদায়ের চেষ্টা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় শক্তিশালী দেশের সমর্থন লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এছাড়াও ১৯৭১ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় যান। এছাড়া লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ১ আগস্ট বিচারপতি সাঈদ চৌধুরী এক বক্তৃতায় মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশনার কথা ঘোষণা করলে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে নিয়োজিত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের চাকরি ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এভাবে ফিলিপাইন, ওয়াশিংটন, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়োজিত পাক

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়ে নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। মুজিবনগর সরকার নরওয়ে, সুইডেন, মিশর, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সাথেও কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিল।

- প্রশ্ন ▶ ৫** ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলা তার স্বাধীনতার গৌরব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় পর পূর্ব বাংলার আরেক আম্রকাননে স্বাধীনতার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। শুরু হয় বাংলার ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়। ◀ **শিখনফল-৫**
- ক. লিয়াকত আলী খান কত সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন? ১
 - খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 - গ. উদ্দীপকে পূর্ব বাংলার যে বিশেষ ঘটনার ইজিত রয়েছে- তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে তার গঠন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। ৩
 - ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে উক্ত বিশেষ ঘটনাটির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক** লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন।
- খ** ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রণীত গণতন্ত্রকে মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়।
- মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র। যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান এ গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এটি ছিল চার স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থা। আইয়ুব খানের এ গণতন্ত্রে ভোটাধিকার সীমিত হয়ে পড়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।
- গ** উদ্দীপকে পূর্ব বাংলার মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রতি ইজিত করা হয়েছে।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ।

এ যুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নামানুসারে এ সরকারের পরিচিতি হয় মুজিবনগর সরকার নামে। এ সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান। পররাষ্ট্র, আইন মন্ত্রী ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি, চিফ অফ স্টাফ এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন যথাক্রমে কর্নেল এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল আব্দুর রব ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উক্ত বিশেষ ঘটনাটি অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য— উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক প্রচেষ্টাকে সংগঠিত ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করাই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রথম কর্তব্য।

এছাড়াও মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত, পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে প্রচেষ্টা চালায় এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এ সরকার বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে সাহায্য, সহানুভূতি, সমর্থন ও স্বীকৃতি লাভ করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। বিদেশের নিকট মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচারণা মিশন চালায়। এ সরকার পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। আর এ সরকারের পক্ষ হতে অনেক নেতা ও বুদ্ধিজীবী এবং বাঙালি কূটনৈতিক পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার বিষয়টি বিদেশিদের নিকট তুলে ধরে। তাছাড়া বেসামরিক প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার ১২টি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। মুক্ত এলাকা শাসন করার ব্যবস্থা করে সেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ নেয়। অধিকন্তু মুজিবনগর সরকার পাক-দখলকৃত ও মুক্ত এলাকার জনগণের নৈতিক ও সংগ্রামী মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। মুজিবনগর সরকার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও আশাদীপ্ত করে এবং পাক বাহিনীর মনোবল বিনষ্ট করতেও তৎপর হয়। তাছাড়া মুজিবনগর সরকার দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ একটি সরকার কাঠামো-

প্রতিষ্ঠা-১০ এপ্রিল ১৯৭১ সাল।
রাষ্ট্রপতি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
উপ-রাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমেদ।

◀ **শিখনফল-৫**

- ক. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সরকারের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উক্ত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- খ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিমিত। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু করেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গানের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তাকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব দেখা দেয়। এ পরিস্থিতির পরিস্থিতিতে প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠন করেন প্রবাসী সরকার যার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় ১৭ এপ্রিল। এ সরকারে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করা হয় কিন্তু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি

থাকায় তার অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এবং প্রধানমন্ত্রী করা হয় তাজউদ্দীন আহমদকে।

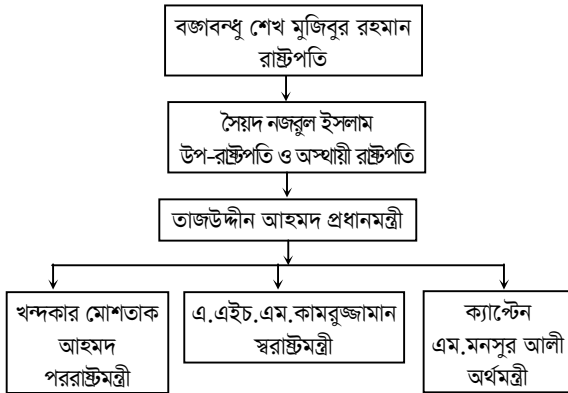
উদ্দীপকে একটি সরকার কাঠামো দেখানো হয়েছে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এবং এ সরকারের রাষ্ট্রপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী করা হয় যথাক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদকে। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী সরকারের কথা বলা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উক্ত সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

১৯৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এ সকল মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ১১ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এছাড়া কিছু সাব সেক্টর ও তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কিছু বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকে যে সরকারের কাঠামোটি প্রদর্শিত হয়েছে তা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তথা মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে। এ সরকার যুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক ছিল।

তাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৭



◀ **শিখনফল-৫**

- ক. ছকে উল্লিখিত কাঠামোটি কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ১
- খ. এ সরকার কখন কোথায় গঠিত হয়? ২
- গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছকে উল্লিখিত সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে এ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল।— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছকে উল্লিখিত সরকার কাঠামোটি মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

খ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। এ সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আশ্রয়স্থানে গঠিত হয়েছিল।

গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। এ সরকার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক প্রচেষ্টাকে সংগঠিত রূপ দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত, পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে প্রচেষ্টা চালায়। আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই সকল উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রধানত ভারত সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখে। মুজিবনগর সরকার বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর নিকট হতে সাহায্য, সমর্থন ও স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়। বিদেশিদের নিকট মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রচারাভিযান চালায়। আর মুজিবনগর সরকার বেসামরিক প্রশাসন গঠন করে মুক্ত এলাকা শাসন করার ব্যবস্থা করে এবং মুক্ত এলাকার জনগণের নৈতিক ও সংগ্রামী মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। আর এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। ফলে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

১০ এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে পূর্ব পাকিস্তানকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এ ছাড়া কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনী দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থক। মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়।

মুক্তিযুদ্ধে এ সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।



প্রশ্ন ▶ ১ আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের পথিকৃৎ আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও অমায়িক ব্যবহার তাকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এভাবে একজন মেহনতী মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্বার্থান্ধ মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তার ঐতিহাসিক ভাষণ 'Government of the people, by the people and for the people' আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১
- খ. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে বাঙালির মুক্তির পথপ্রদর্শক কোন নেতার প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে।— বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

খ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী যে হত্যাজ্ঞা চালায়, তাই অপারেশন সার্চলাইট।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ঢাকা সফর করেন। পরে ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফর করেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময় ব্যয় করেন। আর টিক্কা খান পাকিস্তান থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পূর্ব পাকিস্তানে জমা করেন। ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান, লে. জে. খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা প্রণয়ন করেন। তারপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে বাঙালির মুক্তির পথপ্রদর্শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তার জ্ঞান, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি এনে দিতে সক্ষম

হয়েছিলেন। তার দয়া, সরলতা, উপস্থিত বুদ্ধি, যোগ্যতা ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে তিনি অতি সহজেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত ও ভাগ্যহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এ ছাড়াও তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকার অর্জনে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনিই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' প্রদান করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এ ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়েই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে নিজেদেরকে পাকিস্তানের অধীনতা থেকে মুক্ত করে।

ঘ উদ্দীপকের ইজিতকৃত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর সেই বক্তব্য 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'— এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৪৮ সালে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন করায় তাকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করা হয়। এ ছাড়াও ১৯৫২ সালের সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। এভাবে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে তিনি অবদান রেখেছিলেন। এছাড়া ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হন। ১৯৬২ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা 'হয় দফা' দাবি উত্থাপন করে তিনি বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করেন। তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়ের করে সরকার তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। তবে জনগণের আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২২ ফেব্রুয়ারি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ক্ষমতায় বসতে পারেনি। ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে তীব্র আন্দোলনের বাতাস বইতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তার অগ্নিবরা ভাষণের ফলে এ আন্দোলন প্রকৃত রূপ লাভ করে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের হত্যাজ্ঞার পর তাকে গ্রেফতার করা হলে গ্রেফতারের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ফলে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে তার নেতৃত্বে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ২ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণে বাধ্য হয়ে ‘ক’ দেশের প্রধান জননেতা যে ঘোষণা দেন তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে দেশটির সেনাবাহিনী জননেতাকে গ্রেফতার করে এবং সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্র-শিক্ষক-জনতা কেউ তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। *পাখানফল-৮*

- ক. এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. একজন প্রতিবাদী নেতা হিসেবে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ‘ক’ দেশে যে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. এই ধরনের হত্যাযজ্ঞ শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল-মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন।

খ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আগরতলা মামলা (১৯৬৮-৬৯) থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালান। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে থেকে যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানানোর আহ্বান করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সকল স্তরের মানুষ স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ঢাকা সফর করেন। পরে ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফর করেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময় ব্যয় করে আর অন্যদিকে টিঙ্কা খান গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পূর্ব পাকিস্তানে জমা করে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার ‘নীলনকশা’ প্রণয়ন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে। আলোচনা ভেঙে দিয়ে গণহত্যা শুরু করায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করেনি। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

ঘ ২৫ মার্চের ভয়াল কালরাতের হত্যাযজ্ঞ শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একইভাবে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চলে পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, কঁচক্ষেত, মিরপুর, রায়ের বাজার, গণকটলি, ধানমন্ডিসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। অপারেশন সার্চ লাইটের হত্যাযজ্ঞ কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বগুড়া, সৈয়দপুর, সিলেটসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করে। রাত দেড়টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের বাড়িতে আক্রমণ করে বাঙালির অবিসংবাদিত জননেতাকে গ্রেফতার করে। তবে তার আগেই বঙ্গবন্ধু ইপিআর (বর্তমান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা শোনামাত্র চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শুধু ঢাকা শহরেই ২৫ মার্চ রাতে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়নি, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও এ কালরাতের বিভীষিকায় নিমজ্জিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩ ধানমন্ডি লেকের পারে রবীন্দ্র সারোবরের উন্মুক্ত মঞ্চার সামনে শেষ বিকেলের রোদে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে শিশু, নর-নারীসহ অগণিত মানুষ। কারণ, কিছুক্ষণ পরেই সেখানে অনুষ্ঠিত হবে ‘ট্রিবিউট টু দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ নামের অনুষ্ঠানটি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনকে স্মরণ ও শ্রদ্ধার্থ জানাতেই প্রথম আলো, এবিসি রেডিও ও দেশ টিভি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে। কারণ, পৃথিবী বিখ্যাত এই গুণী দু’শিল্পী আজ থেকে ৪০ বছর আগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাংলাদেশের গণহত্যা, রক্তের স্রোত, শরণার্থী শিবিরের আশ্রিত মানুষের বেদনার আর্তি তুলে ধরেছিলেন একটি কনসার্টের মাধ্যমে। যোদ্ধাহত মানুষের জন্য তারা তহবিলও সংগ্রহ করেছিলেন। *পাখানফল-৮*

- ক. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে কখন?
খ. বাংলাদেশকে বুদ্ধিভিত্তিক দিক থেকে দুর্বল করার পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে— তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়।

খ বাংলাদেশকে বুদ্ধিভিত্তিক দিক দিয়ে দুর্বল করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী এদেশীয় আলবদর, রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় জাতির সূর্যসন্তানদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে তারা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ শুরু করে দুত হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বাংলাদেশ যেন বিশ্বের বুক মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে তাদেরকে নির্যাতন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইজিত দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে পূর্ব পাকিস্তান নামক আঞ্চলিক প্রদেশ গঠিত হয়। তবে ভৌগোলিক অবস্থান তথা ভূ-খণ্ডের আয়তন, জনসংখ্যা সব দিক দিয়েই পূর্ব পাকিস্তান

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্যতা রেখেছিল। তারপরও শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের অধীন করে রাখা হয়। কিন্তু বাঙালি এ অধীনত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বাঙালি স্বাধীন চেতা জাতি, তাই তারা কারো অধীনত্ব পছন্দ করে না। এজন্যই তারা নানা আন্দোলন, বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছে বার বার। লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত আঞ্চলিক এদেশের স্বায়ত্তশাসন দাবি, সোহরাওয়ার্দীর অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব প্রভৃতি বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহাকে তুলে ধরে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েও ক্ষমতা না পাওয়া বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করে। আর এভাবেই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি।

ঘ আমি মনে করি উল্লিখিত যুদ্ধে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দীর্ঘ নয় মাস চলতে থাকা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এদেশের সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ, যুদ্ধে পাক সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে এদেশের মানুষ নানা কৌশল গ্রহণ করে। আর দেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহায় প্রাণ হারান এদেশের ৩০ লক্ষ মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অনেক আগ থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষকে নানা অত্যাচার নির্যাতন করে। নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনে এদেশের দামাল ছেলেদের প্রাণ দিতে হয়েছে। এরপর নানা পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এদেশের লক্ষ লক্ষ জনতা। কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক সব ধরনের মানুষ তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানিদের বর্বরতার শিকার হয়ে এদেশের অনেক মানুষের সলিল সমাধি হয়। এ প্রেক্ষিতে শুরু হওয়া যুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হন এবং ২ লক্ষ নারী তাদের সম্মত হারান।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদের সুমহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল সবুজের পতাকা সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ৪ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’। বাতাসের প্রচণ্ডতায় এবং বানের পানিতে ভেসে যায় উপকূলবাসীর তিল তিল করে গড়ে তোলা শেষ আশ্রয়স্থল। ভেসে যায় সম্পদসহ অনেক তাজা প্রাণ। সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন নিঃস্ব তখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মানুষ দ্রুত তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। সঠিক পরিকল্পনাই এনে দিয়েছে পূর্ণ সফলতা।

◀ শিখনফল-৪

ক. টিক্কা খান কে ছিলেন?

খ. মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের কার্যক্রম কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে সিডর পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কোন ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “সঠিক পরিকল্পনাই এনে দিতে পারে পূর্ণ সফলতা”— উদ্দীপকের আলোকে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টিক্কা খান পূর্ব বাংলার সামরিক শাসক ছিলেন।

খ স্বাধীনতা বিরোধীরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপকর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে।

স্বাধীনতা বিরোধীরা দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান হোতা ছিল তারা। তাদের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীকে হটানোর জন্য গঠিত হয়েছিল শান্তি কমিটি।

গ উদ্দীপকে সিডর পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেক্টর ব্যবস্থাপনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মূলত, মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেয়। প্রথম থেকেই উর্ধ্বতন বাঙালি অফিসাররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে পুনঃগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী আর প্রধান সেনাপতি হন জেনারেল ওসমানী। মুজিবনগর সরকার ১০ এপ্রিল রণাঙ্গনকে মোট ৪টি সেক্টরে ভাগ করেন। তবে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সেক্টরগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে ১১-১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে সেক্টর কমান্ডারদের অধিবেশনে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সীমানা চিহ্নিত করার পাশাপাশি একজন কমান্ডারের অধীনে প্রতিটি সেক্টর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে সঠিক পরিকল্পনার ফলে ৯ মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সিডরে সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন নিঃস্ব তখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল পরিকল্পনাই এনে দিয়েছে পূর্ণ সফলতা। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সঠিক পরিকল্পনাই পারে পূর্ণ সফলতা এনে দিতে। নিচে এ উক্তিটির সপক্ষে উদ্দীপকের আলোকে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করা হলো :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা এক সোনালি অধ্যায়। কারণ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বহির্বিপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংস, নির্যাতন ও গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। এ লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি

আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিধে বিশেষ দূত নিয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমর্থন ও জনমত আদায়ের চেষ্টা করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় শক্তিশালী দেশের সমর্থন লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এছাড়াও ১৯৭১ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভায় যান। এছাড়া লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ১ আগস্ট বিচারপতি সাঈদ চৌধুরী এক বক্তৃতায় মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশনার কথা ঘোষণা করলে লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে নিয়োজিত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের চাকরি ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এভাবে ফিলিপাইন, ওয়াশিংটন, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়োজিত পাক রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আর রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে মুজিবনগর সরকারে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়ে নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। মুজিবনগর সরকার নরওয়ে, সুইডেন, মিশর, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সাথেও কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ ১৭৫৭ সালে পলাশীর আত্মকাননে বাংলা তার স্বাধীনতার গৌরব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় পর পূর্ব বাংলার আরেক আত্মকাননে স্বাধীনতার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। শুরু হয় বাংলার ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়। ◀ *শিখনফলঃ ৫*

- ক. লিয়াকত আলী খান কত সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন? ১
- খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে পূর্ব বাংলার যে বিশেষ ঘটনার ইজিত রয়েছে- তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে তার গঠন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উক্ত বিশেষ ঘটনাটির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

খ ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রণীত গণতন্ত্রকে মৌলিক গণতন্ত্র বলা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র। যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান এ গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এটি ছিল চার স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থা। আইয়ুব খানের এ গণতন্ত্রে ভোটাধিকার সীমিত হয়ে পড়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গ উদ্দীপকে পূর্ব বাংলার মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ।

এ যুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আত্মকাননে। এ সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নামানুসারে এ সরকারের পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। এ সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান। পররাষ্ট্র, আইন মন্ত্রী ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি, চিফ অফ স্টাফ এবং ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন যথাক্রমে কর্নেল এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল আব্দুর রব ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উক্ত বিশেষ ঘটনাটি অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য— উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক প্রচেষ্টাকে সংগঠিত ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করাই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রথম কর্তব্য। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত, পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করতে প্রচেষ্টা চালায় এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এ সরকার বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে সাহায্য, সহানুভূতি, সমর্থন ও স্বীকৃতি লাভ করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। বিদেশের নিকট মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচারণা মিশন চালায়। এ সরকার পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। আর এ সরকারের পক্ষ হতে অনেক নেতা ও বুদ্ধিজীবী এবং বাঙালি কূটনৈতিক পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার বিষয়টি বিদেশিদের নিকট তুলে ধরে। তাছাড়া বেসামরিক প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার ১২টি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। মুক্ত এলাকা শাসন করার ব্যবস্থা করে সেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ নেয়। অধিকন্তু মুজিবনগর সরকার পাক-দখলকৃত ও মুক্ত এলাকার জনগণের নৈতিক ও সংগ্রামী মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। মুজিবনগর সরকার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও আশাদীপ্ত করে এবং পাক বাহিনীর মনোবল বিনষ্ট করতেও তৎপর হয়। তাছাড়া মুজিবনগর সরকার দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে।